সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাসের অন্তর্কাঠামো

শান্তনু কায়সার

এক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দুর্গেশনন্দিনী প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত লিখেছেন, 'আমি তাঁহার পুস্তকের উপাখ্যান ভাগের খুব প্রশংসা করিলাম এবং লেখার সম্বন্ধে বলিলাম পুস্তকের বাঙ্গালা ইংরাজী অনুবাদের ন্যায় বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু তখন আমার মন্তব্যে তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ দশায় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ''আমার লেখা আজ রীতিমত বাঙ্গালা হয় নাই। আজও দেখিতে পাই স্থানে স্থানে যে ইংরাজীর অনুবাদ করিয়াছি।'' এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী মন্তব্য অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ, ''তখনকার প্রায় সমস্ত ইংরাজী শিক্ষিত লোকের বাঙ্গালায় এই দোষ।''' 'সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে তিনি যা বলেছিলেন তাতেও বিষয়টি বোঝা যায়, '...বঙ্গদর্শনের আমোলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া ''রিভাইজ'' না করিয়া কাহারও কপি প্রেসে দিতাম না। চন্দ্রনাথের শকুন্তলা দেখেছ ত, চন্দ্র একেবারে বাংলা অক্ষরে ইংরাজী লিখেছিলেন। খুব খাটতে হয়েছিল... । তবু এখনও শকুন্তলায় ইংরাজী গন্ধ আছে।' মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'বঙ্কিমবাবু ...মৃণালিনী- তে নাটকের উপর ইংরাজী মেজাজ আরোপ করিয়া বলিয়াছিলেন - পাপীয়সি নিজ মুখে স্বীকৃতা হইলি।'[১]

এর উৎস পশ্চিমি ইয়োরোপীয় মডেলে অভ্যস্ত বিদ্বৎ তথা লেখকসমাজ। বঙ্কিমের স্বীকারোক্তি থেকে তার স্বরূপ বোঝা সম্ভব। অন্যদিকে এই স্বীকারোক্তি থেকে এও বোঝা যায়, সম্ভব না হলেও ওই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনও কোনো কোনো লেখক অন্তত অনুভব করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মোটামুটি মধ্যপর্বে রচিত দুটি উপন্যাস, সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিতমানস এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম এ ওই প্রয়াসের একটি পরিণতি লক্ষ করি। 'ঢোঁড়াই' প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখকের কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করা যাক:

ক. রামায়ণের কাঠামো কৃত্রিম মনে হলেও...এর tradition ভারতের লোকের মজ্জায় মজ্জায়। ভেবেছিলাম রামচরিতমানস - এর Frame-এ ঢোকাব - কিন্তু সেটা / Tolstoy (এর) War and Peace (এর?) অনেক জায়গায় এত dull মনে হয়েছে। Tolstoy-এর হাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নভেলে যা dull আমি সেটা চেষ্টা করিনি। তার চেয়ে সহজ জিনিস চেষ্টা করেছিলাম।

খ. ঢোঁড়াইয়ের চরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম এক গণ্ডূষ গল্পের মধ্যে ধরতে। পারিনি।

গ. তাতমা (ধাঙড়) টুলিতে ঢোঁড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল।...এখানকার (বিহারের) গ্রামাঞ্চলে ও নামটা খুব চলে। তবে তার হিন্দীতে বানান হল ঢোঢ়াই; উচ্চারণ ঢোড়াহাই। বাঙালিরা নিজেদের ধরনের করে নিয়েছে ঢোঁড়াই। আমি বাঙালাভাষীদের ভুল বানানটা নিয়েছিলাম, ওই নামের অনুষঙ্গে নির্বিষ সাপের ইঙ্গিতটুকু আনবার জন্য।

ঘ. এই ঢোঁড়াইকে এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল আমার সম্মুখে। শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না।

...আমার কাজ হল চেনা ঢোঁড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে সে সারা দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

ঙ. কথা হচ্ছে যে এ যখন আসল ঢোঁড়াইকে বদলাতে হল তখন চেনা ঢোঁড়াইকে না নিয়ে লিখলেই হত। একেবারে... সম্পূর্ণ কল্পনা দিয়ে একটি চরিত্র সৃষ্টি করলেই হত।

চ. এখন মনে হয় এত খুঁটিয়ে বিবরণ না দিলেই হত; ও ভাষা, ও ভঙ্গি না নিলেই হত! যে ঢোঁড়াই -এর চরিত্র সমস্ত চেষ্টার কেন্দ্রীয় আবেদন, সেইটাই কি পুঙ্খানপুঙ্খ বিবরণের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি? এর চেয়ে তাতমাটুলির দোষেগুণে - ভরা চেনা ঢোঁড়াইকে না বদলে হুবহু তুলে ধরলেই বোধ হয় ছিল ভাল।[২]

যে উপন্যাসের তুলসীদাসের রামচরিতমানস-এর চৌপাই বা দোহা পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে দেশজ কাঠামোয় সেই উপন্যাস লিখতে গিয়ে স্বভাবতই লেখককে নানাভাবে দ্বিধান্বিত ও বিব্রত হতে হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই প্রয়াস থেকে যে তিনি বিচ্যুত হননি সেটিই তাঁকে ভারতীয় বা দেশজ কাঠামোয় নিজের রচনা সমাপ্তকরণে গিয়ে নিয়ে গেছে। ঢোঁড়াই-এর নামের বঙ্গীকরণ থেকে তুলসীদাসী রামায়ণের কাঠামো অনুসরণ এবং চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধা সত্ত্বেও 'representation' -এর পরিবর্তে এর 'transformation' -এ লৌকিক ভিত্তির ওপর লেখকের সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ বাংলা উপন্যাসকে শেকড়ে প্রোথিত হতে ও তার সত্তাকে আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অন্যদিকে 'তিতাস' যে শুধু তৃণমূলের জীবনকে চিত্রণ করেছে তাই শুধু নয়, বরং তার বর্ণনার ভঙ্গি থেকে উপন্যাস কাঠামো পর্যন্ত সর্বত্র লৌকিক বিন্যাস অনুসৃত। লোকজ শব্দ ও বাগধারার ব্যবহার কিংবা চরিত্রসমূহে ব্যবহৃত হেঁয়ালি পাশচাত্য মডেলের উপন্যাস - রীতিকে উপেক্ষা করে এর লোকজ ও লোকায়ত ধারাতেই নিজেকে ঋদ্ধ ও পুষ্ট করেছে। 'সর্পমুগ্ধের মতো চাহিয়া থাকিয়াই পরনের বসন - আঁচলে বুকের শিশু স্তন দুটি ঢাকিয়া দিল' কিংবা মালো কিশোরীরদের প্রসঙ্গে 'মনের চঞ্চলতা শরীরে ফুটিয়া বাহির হয়' অথবা 'দেখ জাল্লা, উতলা হইয়া পাখির মতো পাখ বাড়াইওনা, রইয়া সইযা আগমন কইর', ইত্যাকার বর্ণনা যে আমাদের নিজেদের রূপ, রস ও সত্তার প্রকাশ তা না বললেও চলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাসের অন্তর্কাঠামোর বিচার করে দেখা যেতে পারে। তার শেষ দুটি উপন্যাস বিদেশে রচিত হওয়ায় তাঁর ওপর পশ্চিমি তথা ইয়োরোপীয় মডেলের যে প্রভাবের প্রসঙ্গ প্রায় সর্বদা ও অনিবার্যভাবে উত্থাপিত হয় সে বিতর্কে প্রবেশ না করে আমরা বরং লেখকের সাক্ষ্যগ্রহণ ও দেশজ অন্তর্কাঠামো কীভাবে তাঁর অন্তঃপ্রেরণায় পরিণত হয়েছে কিংবা ওই অন্তঃপ্রেরণা থেকে এই অন্তর্কাঠামো গড়ে উঠেছে তা ভেবে দেখতে পারি। প্রসঙ্গত দুটি উপন্যাসের কথা বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা। আনন্দমঠের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং এক্ষেত্রে লেখকের অর্জনকে শ্রদ্ধা জানিয়েও বলা প্রয়োজন, এ উপন্যাসে যে ঐতিহাসিক বিকৃতি ঘটেছে তা দৃশ্যত ইংরেজের গোলামির কারণে অবশ্যই, কিন্তু গোলামির আসল কারণ, লেখকের শেকড়চ্যুতি যাতে অন্যান্য দোষের সঙ্গে উপন্যাসের পশ্চিমি মডেল যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বসবাসরত দুটি সম্প্রদায়কে পরস্পরের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে তেমনি শিল্পরূপও বিঘ্নিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করায় ইলিয়াসের ওই দুই সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক আত্মীয়তা পুনঃস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এর লৌকিক শেকড়েই তার উপযুক্ত শিল্পরূপকে খুঁজে পেয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র যখন কোনো বই প্রকাশিত হয়নি, সেই ১৯৪৩ - ৪৪ সালে এবং যখন তাঁর রচনাবলি প্রায় সম্পূর্ণই হয়নি, সেই ১৯৬৯ - ৭০ সালে (১৯৭১ -এর ১০ অক্টোবর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় প্যারিসে পঞ্চাশে পৌঁছোনোর পূর্বেই তাঁর মৃত্যু) লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকে বোঝাযায়, তিনি কতটা শেকড়বদ্ধ ছিলেন। তেতাল্লিশে কাজি আফসারউদ্দিন আহমদকে একাধিক চিঠিতে লিখেছেন, 'আমরা মুসলমান। হয়তো - বা মাত্র কয়েক ঘর আমরা শহরে বাস করি এবং আমাদের বাড়ি শহরে। তাছাড়া যে - বিরাট সমাজ সভ্যতার জঞ্জাল, সে-সমাজের পক্ষে অতি আধুনিকতম সাহিত্যের তেমন প্রয়োজন রয়েছে কী? এবং সে-সাহিত্য যদি ব্যর্থ হয় তবে সে ব্যর্থতা হবে সেই - রকম - ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা ছেড়ে কিছুরও মধ্যস্থতা না নিয়ে এক লাভে সূরিয়লিজম শুরু করার যে - ব্যর্থতা।' 'পশ্চিম জগত আজ যতখানি এগিয়েছে ততখানি এগুতে আমাদের ঢের দেরী। ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়তো ততখানি এগিয়ে যাবো বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমার লেখা পিছিয়ে রাখবো তাদের জন্য যারা পিছিয়ে আছে।' চুয়াল্লিশে সৈয়দ নূরুদ্দিনকে লিখেছেন, 'আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এ কঠিন মর্ত্যেই আমার বাস, এ মর্ত্যকে আমি চিনি, এর লোকদের আমার ভালো লাগে, তাছাড়া তাদের ঘৃণাও করি।' ১৯৬৯ -এ সুহৃদ ও সহযাত্রী শওকত ওসমানকে দেশে আসা প্রসঙ্গে লিখেছেন, '...মিটিং সভার ব্যবস্থা কেউ যেন না করে। দেশে আসছি বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন দেখতে, দেশের হাওয়া - পানি খেতে, আকাশের বনলতার রঙ দেখতে।' চাঁদের অমাবস্যা প্রসঙ্গে সমালোচকের মতামত বিষয়ে অন্য চিঠিতে লিখেছেন, 'বিদেশে থাকলেও দেশান্তর ঘটেনি, মানে ইমিগ্রেন্ট - এর দলে ঢুকিনি।' সত্তরের, নভেম্বরের, গর্কিতে যখন দক্ষিণবঙ্গ বিধ্বস্ত ও উনসত্তর পূর্ব বাংলা ক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত তখন শওকত ওসমানকেই তিনি লিখেছেন, 'তুমি দুটি কথা লিখেছ; কিন্তু তাতেই যতটা জানতে পারলাম ততটা বিদেশী সাংবাদিকদের হাজার হাজার শব্দে জানতে পারিনি। কে একজন বলেছেন, সাংবাদিকরা খবর দেয় feeling দেয় না। কথাটা সত্য।'

ওয়ালীউল্লাহ্ যে লিখেছেন বিদেশে থাকলেও 'দেশান্তর' ঘটেনি সেটি তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস লালসালু কলকাতায় শুরু করলেও শেষ করেন ঢাকায়। বাকি দুটি উপন্যাস, চাঁদের অমাবস্যা ও কাঁদো নদী কাঁদো ফরাসি দেশে লেখা। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি প্রায় এড়িয়ে যায়, উপন্যাসত্রয় ধারাবাহিকতায় ঋদ্ধ এবং সকল উপন্যাসের কনটেন্টই শুধু দেশজ নয়, তাদের অন্তর্কাঠামোও তাই। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

লালসালু-তে মজিদ সুরা আননূর-এর কথা বলে। মজিদের জন্যে না হয় তা প্রয়োজনানুগ ও স্বাভাবিক। কিন্তু চাঁদের অমাবস্যা-র স্কুল - শিক্ষক আরেফও সুরা ফালাক ও সুরা লাহাব পড়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চায়। দ্বিতীয় উপন্যাসটি বিদেশে বসে বিদেশিদের আতিথ্যে থেকে লিখলেও বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের মূল জায়গাটি শনাক্ত করতে গিয়ে লেখকের পক্ষে যেমন তার পটভূমিটি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না তেমনি তার অন্তর্লোককে এর অন্তর্গত কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করাও ছিল অসম্ভব। আর এর ফলে উপন্যাসের মৌল কাঠামোটি তার শেকড়েই প্রাণ খুঁজে পেয়েছিল।

চাঁদের অমাবস্যায় তেরো অধ্যায়ে বিভ্রান্ত আরেফ 'নিঃশব্দে সুরা আল্ - খালাক (সূরা ফালাক) পড়ে' পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। তার মনে হয়, 'অসংখ্যবার পড়েও যে -সূরাটি তার মনে কখনো আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই, আজ সে-সূরার প্রতিটি শব্দ সহস্র অর্থে ঐশ্বর্যশীল হয়ে ওঠে। তাতে আশ্রয় - রক্ষার জন্যে নিঃসহায়ের যে আকুল আবেদন সে - আবেদনের মর্মার্থও সহসা পরিস্কারও হয়ে ওঠে। তার সাহায্যের দরকার।' সুরা ফালাকে ' দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ-র নামে' বলা হয়েছে, 'বলো, আমি শরণ লইতেছি ঊষার স্রষ্টার, তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনির্দিষ্ট হইতে, অনিষ্ট হইতে রাত্রির, যখন উহা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং সেই সমস্ত নারীদিগের অনিষ্ট হইতে যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকারে দিয়া যাদু করে...।' [৪] বাঁশঝাড়ে হত্যাকাণ্ডটির শিকার এক মাঝির স্ত্রী, এবং তা করেছে 'দরবেশ' বলে কথিত কাদের। ফলে অনিষ্ট বা অন্ধকার থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা স্বাভাবিক হলেও 'নারী'র অনিষ্ট বা তা থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা এখানে প্রাসঙ্গিক কিংবা যথাযথ নয়। ফলে 'যুবক শিক্ষক শীঘ্র একথা উপলব্ধি করে যে, ভাবাপ্লুত হয়ে সজ্ঞানে প্রার্থনা করেও সে মনে শান্তি পাচ্ছে না। শীঘ্র তার মনে হয়, হয়তো কাদেরের উপস্থিতিই তার অশান্তির কারণ।' অতএব 'অশান্তি কাটে না দেখে যুবক শিক্ষক আরেকটি সূরা পছন্দ করে। কেন সেটি পছন্দ করে তা বোঝে না, কিন্তু তৃষ্ণার্তের মত অধীরভাবে নিঃশব্দে তা আওড়াতে থাকে। দ্রুতভাবে তার ঠোঁট নড়ে, মনের গহ্বর থেকে সূরাটির শব্দগুলি অনর্গল ধারায় কিন্তু অশ্রোতব্যভাবে ঝরতে থাকে, তার চোখে চঞ্চলতা আসে। আবু লাহাবের শক্তি ধ্বংস হবে, সে ধ্বংস হবে; তার ধনসম্পত্তি তাতে রক্ষা করতে পারবে না। লেলিহান আগুনে সে নিক্ষিপ্ত হবে, স্ত্রী - কষ্টবাহক স্ত্রী তার গলায় তালতন্ত্র তৈরি ফাঁস দড়ি পড়বে। সুরাটি পড়তে পড়তে তার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে, কিন্তু আবৃত্তিতে একটু স্খলন হয় না, মনে কোন ভয়ও থাকে না। কেন সে সূরাটি পড়ছে? তার চোখে কাদের কী আবু লাহাব - দম্পতিতে রূপান্তরিত হয়েছে? তাদের পাপ কী তার পাপের সমতুল্য? তাদের যে শাস্তিবিধান কেতাবে লিখিত সে শাস্তিবিধানই কী যুবক শিক্ষক তার জন্য কামনা করে? অথবা পাপীর যে শাস্তি অনিবার্য সে বিষয়ে তার মনকে সে কী নিশ্চিত করতে চায় যাতে তার সম্মুখে যে-কঠোর কর্তব্য সে কর্তব্যপালনে তার মধ্যে কেন দুর্বলতা না দেখা দেয়?' এ অবস্থায় 'বাইরে শান্তচিত্ত ব্যক্তির মত...নামাজ পড়লেও' ভেতরে তার 'অশান্তির জ্বালা।'

এবার দেখা যাক কী পরিস্থিতিতে লালসালু-র মজিদ সুরা নূরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। তাহেরের মা নিজের সন্তানের জন্ম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে তাহেরের বাবাকে বিব্রত করায় তার সুযোগ নিয়ে মজিদ নবির স্ত্রী বিবি আয়েশোর নামেও যে বদনাম ওঠে সে প্রসঙ্গে নাজির হওয়া এই সুরার কথা বলে এবং এভাবে তার উপসংহার টানে, '...যে- মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়। তার গুণাহ্ বড় মস্ত গুণাহ্, তার শাস্তি।' যদিও এ সুরাতে বলা হয়েছে, 'ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচারী উহাদিগের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে; আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে উহাদিকের প্রতি দয়া যে তোমাদিগকে অভিভূত না করে যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; বিধর্মীগিদের একটি দল যেন উহাদিগের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' কিংবা 'বিশ্বাসী নারীদিগকে বলো, তাহারা যেন তাহাদিকের দৃষ্টিতে সংযত করে ও তাহাদিগের যৌন অঙ্গের হিফাজত করে', তবু এখানে একইসঙ্গে অপবাদ রটনাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করা এবং তর উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অথচ পরিস্থিতি ও মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির সুযোগ নিয়ে মজিদ এই কাজটিই করছে। সজ্ঞানে মিথ্যে বলে তওবা কাটা কিংবা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা তার লুম্পেন চরিত্রের উপযুক্ত কাজই বটে।

ওয়ালীউল্লাহ্ আটচল্লিশের মধ্যে এ উপন্যাস রচনা সমাপ্ত করেছেন। তার পরবর্তীকালে, ভাষা - আন্দোলন পর্বের প্রথম পর্যায়ে ১৯৫০-এ পূর্ব পাকিস্তান আরবি সমিতি যে স্মারকলিপি প্রকাশ করে তাতে কোরান শরিফের এই উদ্ধৃতি দেওয়া হয় 'নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ' তাহা আরবি ভাষাতেই কুররআনরূপে নায়িল করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।' উদ্ধৃতিটি তারা ব্যবহার করেছিল এটা বোঝাতে যে, মাতৃভাষা বাংলার চেয়ে মুসলমানের কাছে আরবির প্রয়োজন ও গুরুত্ব বেশি। অথচ উদ্ধৃতিটির মর্ম বলে, যা সহজে বোধগম্য সেই মাতৃভাষার গুরুত্বই প্রথম।

একারণে তৎকালীন ধর্মীয় কিন্তু অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য হিব্রু ভাষার পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্য আরবিব ভাষায় কোরান নাজিল হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাব - উত্তর কলকাতা পাকিস্তানি জ্বরে আক্রান্ত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিক্রিয়া সেখানে অবস্থান করে লেখক নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভালোভাবে অনুভব করেছিলেন। ফলে মজিদদের ওই লুম্পেন মনোবৃত্তি তথা ধর্মের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা ও তার ব্যবহার লেখকের স্পষ্ট ও তীব্র মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। লালসালু-র প্রায় শুরুতে, তৃতীয় পৃষ্ঠার মধ্যেই যে বর্ণনা পাই তাতে এর সাক্ষ্য মেলে : 'এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান।' এর উলটোদিকে আওয়ালপুরের পির যে তার 'বোঝানোর পন্থা' কে 'প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে' তা একই মুদ্রার এপিঠ - ওপিঠ। এর অন্তর্দৃষ্টি ও কাঠামো ধরতে ও অনুসরণ করতে পেরেছিলেন বলেই ওয়ালীউল্লাহ্ রামের জন্মের পূর্বেই রামায়ণ অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই অথবা তার সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তার পরবর্তীকালের ঘটনা ও চরিত্রসমূহকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উপন্যাসের প্রায় শুরুতে এই বাক্য 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি' শৈলী ও বক্তব্যকে পরস্পরের দ্বারা ঋদ্ধ করেছে। ধর্মের যে বৃহৎ মানবিক পটভূমি তাকে হত্যা করলে এর বহিরঙ্গের প্রকাশ যে শস্যের শত্রু আগাছার সঙ্গেই তুলনীয় তা ঔপন্যাসিক বড়ো সহজে কিন্তু শিল্পোচিতভাবে প্রকাশ করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্-র কাঠামোটি তাঁর উপন্যাস - শরীরে এমনভাবে এঁটে আছে যে তা বাহুল্যবর্জিত ও নির্মেদ না হয়ে পারেনি। প্রকাশ্য স্থানে পিতা - পুত্রের খৎনা করানো, 'তোমার দাড়ি কই মিঞা'? বলে আক্কাসের স্কুলের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে শুরুতেই নস্যাৎ করে দেওয়া, কিংবা ঔপন্যাসিক যে বলেছেন 'লোকেরা বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা' তা মজিদের শক্তির উৎস। এবং এই উৎসের উৎস ধর্মের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যবহার। ফলে লালসালু-র প্রতি - নায়কের প্রচণ্ড শরীরী লোভ থাকা ও তার দ্বারা তাড়িত সওয়া সত্ত্বেও নিজের বস্তুগত সাফল্যের জন্যে সে তাকে প্রশ্রয় দিতে সম্মত ও প্রস্তুত নয়। সন্তান কামনায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী পিরের কাছ থেকে পানিপড়া আনার জন্যে নিজের ক্ষমতা - কাঠামোর সহযোগী খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবিকেও এ কারণেই সে ক্ষমা করতে রাজি নয়। স্ত্রীর পেটে বেড়ি পড়ার অজুহাতে সে শেষ পর্যন্ত খালেক ব্যাপারীকে তাকে তালাক দিতেও বাধ্য করে। কিন্তু এ বিষয়ে খালেক ব্যাপারী যেন তাকে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে না পারে সে বিষয়েও সে সম্পূর্ণ সতর্ক ও সজাগ থাকে। তার বিবির পেটের প্যাঁচ ছাড়ানো যায় কি না - খালেক ব্যাপারীর এইরকম জিজ্ঞাসার জবাবে সে যা ভাবে তাতে ওই সতর্কতার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়, 'কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে, মজিদ তার স্ত্রী উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে - তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।' মূল বিষয় অর্জিত হলে নারী উপজাত হবে অথবা আসল বিষয়ের কাছে নারী অত্যন্ত তুচ্ছ ভেবে এ বিষয়ে তার আপাত নির্লিপ্তি। ঔপন্যাসিক যে বলেছেন 'সে সদা হুঁশিয়ার' তাই মজিদ ও মজিদদের সম্পর্কে আসল সত্য। 'জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী...এমন খাপে খাপে মিলে গেছে যে অজান্তে অনিচ্ছায়ও দু-জনের পক্ষে উল্টোপথে যাওয়া সম্ভব নয়' জেনেও নিজের প্রয়োজনে ব্যাপারীকে সে এমনভাবে জব্দ করে যে সে উত্থানরহিত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় 'বিস্তর জমিজমা' শুধু তার 'স্থূল দেহটা'ই নয়, তাকেও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।

এ সম্মোহনের একটি প্রকাশ ঘটে জিকিরে। জিকিরের যে বর্ণনা ঔপন্যাসিক দিয়েছেন তাতে পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটাও সম্ভব। মনে হতে পারে এতে বুঝি তাঁর প্রশ্রয় কিংবা সমর্থন রয়েছে। কিন্তু বর্ণনার ওই কাব্যিক রূপ আসলে সম্মোহন যে কতটা দ্রবীভূত করতে পারে তারই প্রকাশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মজিদের দ্বিতীয় ও তরুণী স্ত্রী জমিলা যে নির্মোহ থেকে একসময় তলিয়ে যাওয়া মানুষের মতো হয়েও তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস চালায় তাই বলে দেয়, ঔপন্যাসিক কাকে ও কী চিত্রণ করতে চান। তাঁর বর্ণনায় যে পাই 'এত করেও যার মনে ভয় হয়নি তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের' কিংবা 'ভেবেছিল, হাত - পা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকলো মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে' অথবা মজিদের 'আত্মপ্রত্যয়' তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তির আইছে, মনে আর শয়তানি নাই'র প্রতিক্রিয়ায় 'জমিলা কাঁদলোও না, কিছু বললোও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মত বসে রইলো' তা থেকে সহজেই ঔপন্যাসিকের অভিপ্সিত বোঝা যায়।

উপন্যাসের অন্তিমে মজিদও সমস্ত 'অনিষ্ট' থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সুরা ফালাক পড়ে। মজিদের অপরাধবোধ না হয় তাকে দিয়ে তা করিয়ে নেয়। কিন্তু চাঁদের অমাবস্যা-র আরেফের ব্যাপারটা কী? মজিদ মিথ্যাকে সত্য করে তোলে, তার জন্যে তার ধর্মের আশ্রয় প্রয়োজন, আর আরেফ সত্যকে এড়াতে চায়, সেজন্য তারও ওই আশ্রয়ের দরকার। কিন্তু সত্যের মুখোমুখি হয় না বলে কোনো সুরাও তাকে শান্তি দিতে পারে না। এজন্যে 'ফালাক' থেকে সে 'লাহাবে' যায়, কিন্তু দ্বিতীয় সুরার মর্ম যেখানে সত্যকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষীকরণ সেখানে তা না হলে কেবলই ধর্মের বর্ম দিয়ে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। সেজন্য আরেফের ওই ঘূর্ণয়ন। কাঁদো নদী কাঁদো-তে এই কাঠামো একটি পূর্ণতা পায়। বাংলাদেশের একজন প্রধান কথাসাহিত্যিক বিষয়টি ঠিকই অনুমান করেছেন। 'মুহম্মদ মুস্তফা এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র - তার মায়ের নাম আমেনা; যে মেয়েটির সঙ্গে তার বিবাহ হবার কথা হয়েছিল এবং যার মৃত্যুতে মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনের সংকট, তার নাম খোদেজা; মুহাম্মদ মস্তফার পিতা খেদমতুল্লা নামটিও অর্থগত দিক থেকে আবদুল্লাহেরই শব্দান্তর। আর যে নারী চরিত্রটি উপন্যাসের প্রধান তার নাম সকিনা খাতুন। সর্বোপরি মুহাম্মদ মুস্তফার পুরো নামটি? না, সৈয়দ আবু তালের মুহাম্মদ মুস্তফা।...এতোগুলি সাদৃশ্য কী একেবারেই কাকতালীয়?[৫]

উপন্যাসের এই ভেতর-দৃষ্টি ও কাঠামোর এক অভিন্ন সত্তা ঔপন্যাসিককে অত্যন্ত গভীরভাবে তার অংশ করে তোলে। কাঁদো নদী কাঁদো - তেই মুহাম্মদ মুস্তফার বাবা খেদমতুল্লাকে কালু মিঞা যে হত্যা করেনি বা করায়নি কোনো এক জম্মবারে মসজিদে গিয়ে সে স্বীকারোক্তি করার পর ঔপন্যাসিকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তিনি কীভাবে ওই অন্তর্কাঠামোর অংশ হয়ে উঠেছেন; 'শত উপায়ে মানুষকে আত্মরক্ষা করতে হয়, কখনো সত্য বলে কখনো মিথ্যে বলে। এবং কখনও সত্য অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার কখনো জলজ্যান্ত মিথ্যা বিচারকের ঘরেও অখণ্ড সত্য বলে গৃহীত হয়। কথাটি না বলে কালু মিঞার উপায়ই বা কী ছিলো।' অতঃপর পরিপার্শ্বের প্রতিক্রিয়ায় ঔপন্যাসিক হয় উপস্থিত থাকেন, বা অনুপস্থিত থাকলেও তাঁকে অনুভব করা যায় : 'খবরটি সবাইকে স্তম্ভিত করে। বস্তুত কিছু সময়ের জন্যে তাঁকে অনুভব করা যায় : 'খবরটি সবাইকে স্তম্ভিত করে। বস্তুত কিছু সময়ের জন্যে সকলে কেমন বাকশূন্য হয়ে পড়ে। তাদের মনে হয়, মসজিদ ঘরে কথাটি বলে ধূর্ত কালু মিঞা আমাদের সঙ্গে বড়ই শয়তানি করেছে। যেন যাকে আমরা প্রায় ধরে ফেলেছিলাম, সে হাত ফস্কে গিয়ে একটি দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।'

চাঁদের অমাবস্যা-র কাদের বাঁশঝাড়ে তার লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে কারও নজরে পড়ে গেছে বুঝতে পেরে মাঝির বউকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। তার বড়োভাই দাদাসাহেব বলেন বংশগৌরবের কথা, যে 'খানদানী'র অন্যতম মূলভিত্তি 'নেক - চরিত্র'। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আরেফ নানাভাবে তার দায় এড়াতে চায়। প্রথমে সে কাদেরকেই এ থেকে অব্যাহতি দিতে চায়, সে প্রসঙ্গেই সে সুরা ফালাক আবৃত্তি করে, কিন্তু সত্যের প্রত্যক্ষতায় সে বোঝে কাদেরই হত্যাকারী। সেজন্য তাকে অভিযুক্ত করার জন্য সুরা লাহাবের স্মরণ থেকে সে শক্তি সঞ্চয় করতে চায়, কিন্তু তাতেও সফল হয় না। নিজেকে সে বোঝাতে চায় মেয়েটির প্রতি কাদেরের নিশ্চয়ই ভালোবাসা ছিল। কিন্তু কাদের যখন নির্মমভাবে তার

কল্পনাকে ধূলিস্যাৎ করে দেয় তখনই হয় মুশকিল। দাদাসাহেবের আশ্রয়চ্যুত হতে তার ভয়, কিন্তু সত্য এড়াতেও সে বিবেকের সমর্থন পায় না। পাকিস্তানোত্তর নিম্নমধ্যবিত্ত অথবা উঠতি মধ্যবিত্তের এই সংকটই আসলে আরেফ চরিত্রের চাবি - সত্য। সত্যকে সে না পারছে গ্রহণ করতে না পারছে তাকে ত্যাগ করতে। স্মর্তব্য ষোলো পরিচ্ছেদের উপন্যাসের চৌদ্দো পরিচ্ছেদে তার অনুভব: 'কাদের নির্দোষ প্রমাণিত হলেই তার রক্ষা। তাহলে বিবেকের নির্দেশটি তাকে আর শুনতে হবে না, বিপজ্জনক কর্তব্যটিও পালন করতে হবে না।' পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে মধ্যবিত্ত অথবা তাতে উত্তরিত হওয়ার স্বপ্নে মগ্ন জনগোষ্ঠীর যে অংশ এ রাষ্ট্রের জন্মের পরই প্রতারিত কিংবা মোহমুক্ত হয়েছে বলে অনুভব করে, , সে ভাষা - আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার প্রতিবাদ উচ্চারণ করতে চায়। কিন্তু তা যে খুব সহজ ছিল না সেকথা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, ভাষা - আন্দোলন কালে যারা তাকে এড়িয়ে চলেছেন কিংবা সতর্ক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অংশগ্রহণ করেছেন, তারাই আবার উত্তরকালের সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আগ - বাড়িয়ে নিজেদের কাকতালীয় ভূমিকার সাড়ম্বর বর্ণনা দিতে এগিয়ে এসেছেন। আরেফ হচ্ছে উদীয়মান ওই মধ্যবিত্তের নিভৃতচারী ও বিবেকবান অংশ। ফলে নপুংসক কিন্তু বিব্রত অথবা লোভী এই শ্রেণী নিজের দেহকেই কড়িকাঠ থেকে ঝুলতে দেখে, যার বাস্তব পরিণতি ঘটে মুহাম্মদ মুস্তফার মধ্য দিয়ে, যে প্রকৃতই উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা করে।

পুরো একটি লুম্পেন রাষ্ট্রকাঠামো যে তাঁর নাগরিকদেরও দুষিত করতে পারে তার উহাহরণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র তিনটি উপন্যাস। লক্ষণীয় মজিদ, আরেফ ও মুস্তফার 'ক্রমোন্নতি' ঘটেছে। মজিদ ভূমিহীন লুম্পেন, আরেফ স্কুল - শিক্ষক আর মুস্তফা ছোটো হাকিম। ওই দূষিত রাষ্ট্রকাঠামোর তাবৎ ফায়দা লুটে মজিদ নিজের তথাকথিত উত্তরণ ঘটিয়েছে বটে, কিন্তু তা অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। আরেফ আত্মহত্যার কথা ভাবে, কিন্তু তা না করলেও অন্যদের মতো 'সেও নামেই শুধু জীবিত।' আর মুস্তফা তো আত্মহননের পথই বেছে নেয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ যা, এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ততটা নির্লিপ্ত থাকেন না যতটা উপন্যাসের পশ্চিমি মডেল দাবি করে।

দুই

মিখাইল বাখতিন উপন্যাসের নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় দেখিয়েছেন, এর ফর্মের প্রয়োজনেই ঔপন্যাসিককে তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে উপস্থিত থাকতে হয়। লালসালু-র মজিদ প্রসঙ্গে উপন্যাসের শুরুতেই যে জানা যায় 'খোদার এলেমে বুক ভরে না তলার পেট শূন্য বলে তাকে ওই চরিত্রের ভাবনা যদি বলি তাহলে তার কয়েকপৃষ্ঠা পরে সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞা প্রসঙ্গে উচ্চারিত 'খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়' -কে কী বলব? বিপরীত অবস্থানের দুই চরিত্রের ভাবনার এই সাযুজ্য ঔপন্যাসিকের নিঃশব্দ উপস্থিতিরই প্রমাণ দেয়। পর পর তিনটি উপন্যাসে দারিদ্র্য ও বৈরী বাস্তবতার যে বর্ণনা রয়েছে তা পড়লেও ওই উপস্থিতিকে অনুভব না করে পারা যায় না।

ক. এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষাশেষি বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে - ওঠে, এমন সময়ে কোন এক দুপুরে কালো মেঘের সাথে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়তো না - বলে কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোঁচবিদ্ধ হয়ে নিহত জমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ - জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমি নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে। এবং হয়তো তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়তো করে না। (লালসালু)

খ. দক্ষিণে তিন মাইল দূরে তার নিজের গ্রাম। দরিদ্র সংসার, হাতের তালুর মত একটুকরো জমিতে জীবনধারণ চলে না। টেনে - হিঁচড়ে আই. এ. পাশ করে সে দেশে ফিরে আসে। পড়তে পারলে আরো পাশ করতো, কিন্তু কলেজের ফি, বইখাতা কেনার পয়সা আর যোগাড় হয় না। তাছাড়া, জেলাশহরে ঘুপ্‌সি - আস্তানায় থাকলেও খরচ হয়। একরত্তি শাক-সব্জির জমিটাও বিক্রি করে উচ্চশিক্ষার পশ্চাতে ছোটার অর্থ হয় না। (চাঁদের অমাবস্যা)

গ. অনেকক্ষণ ধরে যে যেন হরতনপুর নামক একটি অখ্যাত গ্রামের মকসুত জেলা বলে কোন অজানা মানুষের কথা বলে। লোকটি হতভাগ্য - এমনই হতভাগ্য যে এক বছর যদি বিনা বৃষ্টি দরুন তার ফসল ধ্বংস হয় অন্য বছর ভস্মীভূত হয় নিদারুণ অগ্নিকাণ্ডে, যার প্রিয়জন একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যার বিষয় - সম্পত্তি হাতছাড়া হয় দুবৃত্ত লোকের কারসাজিতে, কাঠ কাটতে গিয়ে কাঠে পা না পড়ে যার পায়েই কুঠার নেবে আসে নির্মমভাবে, অবশেষে মেঘশূন্য আকাশে বজ্রাঘাতের মত অকারণেই যে ভাগ্য - পরাক্রান্ত লোকটি পঙ্গু হয়ে পড়ে। (কাঁদো নদী কাঁদো)

আবার উপন্যাসের অত অবিশ্বাস্য ঘটনার উপস্থাপন যে জীবনেই লভ্য তা ঔপন্যাসিকের নেপথ্য বর্ণনা থেকে বোঝা যায় - 'বুড়ী ছেলের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে। তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে লাগে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।' একইভাবে কাঁদো নদী কাঁদো-র কালু মিঞা মুস্তফার পিতা খেদমতুল্লাকে হত্যা করিয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি, মসজিদের ঘটনার পর মুস্তফা তার প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে ভেবে খেদমতুল্লার অবৈধ সন্তানকে মুস্তফার বলে দাবি করবার ব্যবস্থা করেছে। ভয়ংকর হলেও কালু মিঞার দৃষ্টিকোণ থেকে তার আচরণ যথার্থ তাহেরের মায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে তার রটনা। এই প্রেক্ষাবিন্দু ঔপন্যাসিকই রচনা করেন। ফলে দুটি আলাদা দৃষ্টিবিন্দুর দূরতর ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। তাহেরের মায়ের নিজের বা পরিপার্শ্বের প্রতি ক্রোধ ও তজ্জাত রটনা এক ধরনের প্রতিবাদকেই প্রকাশ করে কিন্তু ওই ধরনের অভিযোগের সামনে মুস্তফা যখন দরুর পড়ে তা কাটাতে চায় তখন সে আরেফের উত্তরসূরি হয়ে পড়ে এবং ওই অস্ত্র যারা ব্যবহার করতে পারে সেই মজিদদের কাছে পরাস্ত হয়।

এভাবে ঔপন্যাসিকের উপস্থিতি ডিসকোর্সকে ভাঙে ও নির্মাণ করে, বিষয়ের পাঠ ও পুনর্পাঠ ঘটে এবং তা বিনির্মিত হয়। লালসালু - তে মজিদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'এ বিচিত্র দুনিয়ায় যারা ...আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে তাদের কদর প্রচুর।' 'তিতাস' -এ বামুন কায়েত ও শিক্ষিত লোকেরা মালোদের চেয়ে বেশি জানত ও বুঝত তাদের চেয়ে এ 'বিচিত্র দুনিয়া' আরও কঠিন ও জটিল। ওয়ালীউল্লাহ্-র তিনটি উপন্যাস বলে, জানা ও বোঝার ওই জগৎটা নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর প্রশ্রয় ও সমর্থন পেয়ে শোষণ - কাঠামোকে অধিক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে চায়। ঢোঁড়াই চরিতমানস-র দুটি চরণের পর তৃতীয় চরণে সতীনাথ স্বাধীনতা - উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামো ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে আটকানো তৃণমূলের মানুষকে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত দুই দশকের সময়সীমায় ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাসত্রয়ে ওই রাষ্ট্রকাঠামোকে ঠিকই শনাক্ত করেন। এক্ষেত্রে রচনার অন্তর্কাঠামো তার বক্তব্যকে স্পষ্ট করেছে।

তিন

লালসালু - তে সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে ব্যাপারীর মক্তবে গিয়ে কলমা শেখার কথা বললে সে তাতে রাজি হয়েও 'বোকার মত বলে,' 'গরীব মানুষ, খাইবার পাই না।' 'বোকার মত' মানে জীবনযাপনের সহজ অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা উচ্চারণ। এর পেছনে ঔপন্যাসিক থাকেন বটে, কিন্তু তাতে প্ররোচিত করেন না, বরং তার বিশ্বাস যাতে প্রকৃত ও উপযুক্ত মাত্রায় উচ্চারিত হতে পারে সেই তিনি দেখেন। অনুপস্থিতির এই উপস্থিতি উপন্যাসের প্রচিলত সংজ্ঞা ও ফর্মকে অস্বীকার করে এক ভিন্ন বিন্যাসই গড়ে তোলে। পরিপূর্ণ বৈরী কাঠামোর তৃণমূলের ইহজাগতিকতাকে প্রকাশের এ এক উপযুক্ত কাঠামো অবশ্যই। উপন্যাসের প্রথম দিকে 'মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়' অথবা 'ভাগ্যকে ঘষে সাফ করার উপায় নেই, কিন্তু যে - জমি জীবন সে- জমিকে জঞ্জাল মুক্ত করে ফসলের জন্য তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই' থেকে বোঝা যায়, সমষ্টি - চরিত্রের আর লেখকের ভাবনার মধ্যে তেমন ভিন্নতা নেই পরে যে জানা যায় 'মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার ধন' তাতে ঈর্ষার পরিবর্তে ইহজাগতিকতা ভাষা পায় এবং 'এত শ্রম এত কষ্টে'র পরেও তাদের 'ভাগ্যের ঠিকঠিকানা' না থাকলেও মজিদের প্রাঙ্গণে এত ধান, এত প্রাচুর্য কেন হেসে ওঠে তাদের মনে সেই জিজ্ঞাসা জাগে তৃণমূলের এই সৎ অবস্থানের কারণে তাহেরের বাপ 'অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জনতে পেরেছে সেকথা...বিশ্বাস করে না।' স্বয়ং মজিদের ভাবনার মধ্য দিয়ে লেখক যে বক্তবতার প্রকাশ ঘটনা তা লেখকের ইহজাগতিকতার সঙ্গে তার শৈলীকেও তুলে ধরে যাতে বোঝা যায় দুইয়ের আত্মঃসম্পর্ক এক অবিচ্ছিন্নতায় ঋদ্ধ : 'অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্টি মাজারের পাশে বসে দুনিযায় অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা প্রকাশের কথা নয়।'

তৃণমূলের এই অবস্থান কাঁদো নদী কাঁদো -তে রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়। তিতাস একটি নদীর নাম - এর প্রথাগত নায়ক - নায়িকা কিশোর ও তার মালাবদল করা স্ত্রী দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পর্ব 'জন্ম - মৃত্যু -বিবাহে'র মধ্যেই মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু তারও পরে বাকি দুটি খণ্ডে মালোজীবন তার শোক ও ক্রোধ নিয়ে বর্ণিত হতে থাকে। লালসালু-তে জমিলার আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের শেষ চতুর্থাংশে। কিন্তু তার নিঃশব্দ অথচ দৃঢ় অবস্থানই উপন্যাসের কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাঁদো নদী কাঁদো -তে মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনকাহিনির পরেই বর্ণিত হয় কুমুরডাঙ্গার বৃত্তান্ত। দুই কাহিনির কথককে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ও তাদের পরিচয়কে অনেকটা অস্পষ্ট রেখে লেখক আসলে উভয়ের এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির গভীরতর যোগসূত্র স্থাপন করেন। মৃত্যুর আগে কুমুরডাঙ্গা সম্পর্কে কফিলুদ্দিনের মনে হয়, '...অনেক কিছু করেও একটি জিনিস উকিল কফিলউদ্দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি : কুমুরডাঙ্গার অবনতি। তার চেয়ে সামনে ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে শহরটি কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। হয়তো একবার কোন শহরের জিভে ঘুণ ধরলে ফুটবল খেলে, স্কুল-ক্লাব বসিয়ে অবনতির মারাত্মক কীটের ক্রম - অগ্রসর ঠেকিয়ে রাখা যায় না।' এই শহরটি যে কোন রাষ্ট্রকাঠামো তা বুঝতে অসুবিধে হয়না। কফিলউদ্দিন যখন আরও ভাবে 'কুমুরডাঙ্গা এবার যেন মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন করেছে' তখন বোঝা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই রাষ্ট্রকাঠামো এ অঞ্চলের মানুষের জন্যে কতটা শ্বাসরোধী ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছিল। আটষট্টিতে প্রকাশিত এই উপন্যাস তাই একই সঙ্গে ধ্বংস্তূপের মধ্যে আসন্ন ভবিষ্যৎকেও প্রত্যক্ষ করে। রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে ওই ঘুণ ও 'মধ্যযুগে'কে পরাস্ত, কার্যত হত্যা করে নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্যে ঊনসত্তরে এই জনপদের সমষ্টি - মানুষ ফুঁসে ওঠে।

পশ্চিমি মডেল কিংবা আরামদায়ক শিল্পকাঠামো আমাদের বাস্তবতা অথবা রাষ্ট্রকাঠামোয় সুপ্ত ওই আগ্নেয়গিরির সন্ধান দিতে পারত না বলেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে তাঁর উপন্যাসের জন্যে নিজস্ব অন্তর্কাঠামোর সন্ধান করতে হয়েছিল।

উল্লখসূত্র :

১. কাছের মানুষ বঙ্কিম/ সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কলকাতা

২. উপন্যাসটি প্রসঙ্গে 'ঢোঁড়াই' প্রবন্ধে কৃত সতীনাথ ভাদুড়ীর মন্তব্য; 'গ্রন্থ প্রসঙ্গ' -এ উদ্ধৃত, সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২ সম্পাদনা : শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, কলকাতা।

৩. চিঠিপত্রসমূহের পূর্ণ বয়ানের জন্যে দ্রষ্টব্য - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-র জীবন ও সাহিত্য, ১ম ও ২য় খণ্ড/ সৈয়দ আবুল মকসুদ; ঢাকা

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ প্রকাশিত কুরআনুল করীম -এর অনুবাদ; সুরাদ্বয়ের ানুবাদ ২য় ও ৩য় খণ্ড থেকে নেয়া

৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-র উপন্যাস/ শওকত আলী : নিরন্তর; নাঈম হাসান সম্পাদিত; শ্রাবণ ১৯৩২, ঢাকা